রামপ্রসাদ সেন ও সমকালীন বাংলা

মুগ্ধ মজুমদার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, mugdhamajumder1992@gmail.com

সারসংক্ষেপঃবাংলার ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক একটি বিশেষ ক্রান্তিকালের নামান্তর। বাংলার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক কিংবা ধর্মীয় পটপ্রেক্ষায় এই শতকটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ কালপর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামপ্রসাদ সেন যিনি ছিলেন মূলত কবিসাধক। বাংলার বহুমাত্রিক টানাপড়েন, মন্বন্তর কিংবা রাজনৈতিক চাপানউতোর থেকে রামপ্রসাদ সেন কীভাবে তাঁর কাব্যজীবন ও সাধক জীবনের সংযোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন? কীভাবে প্রসাদী কাব্যের পরতে পরতে অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাসের নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রবন্ধে তারই অন্বেষণ করা হয়েছে।

মূলশব্দগুচ্ছঃ রামপ্রসাদ সেন, অষ্টাদশ শতক, শ্যামাসংগীত, বাংলা

যেকোনো লেখক বা সৃজনশীল মননের ব্যক্তিত্ব তাঁর সমসাময়িক দেশ-কাল ও পাত্রের সীমাকে পুরোপুরি বর্জন করে সৃষ্টি করতে পারেন না। প্রকৃত প্রতিভা অবশ্যই সমকালকে স্বীকরণ করেই হয়ে ওঠে কালোত্তীর্ণ। কিন্তু তাঁর সময়কালের প্রতিফলন থেকে যায় তাঁর সৃষ্টি-প্রকরণের মধ্যে। অষ্টাদশ শতকের কবি ও সাধক রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কেও এই যুক্তিটি নস্যাৎ করা চলে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা যখন রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে আলোড়িত, সেই বিশেষ ক্রান্তিকালে রামপ্রসাদ সেনের আবির্ভাব। একাধারে শক্তি-সাধনা এবং পাশাপাশি কাব্য রচনার মধ্যে রামপ্রসাদ সেনের প্রকাশ সূচিত হয়েছিল। তিনি 'কালিকামঙ্গল'('বিদ্যাসুন্দর'), 'কালীকীর্তন', 'সীতাবিলাপ'এর পাশাপাশি 'কৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ছিল শ্যামাসংগীত বা শাক্তপদ রচনা। বাংলা পদসাহিত্যে এবং বাংলা গানের যুগল ইতিহাসে রামপ্রসাদী পদাবলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রামপ্রসাদের পদে যেমন তন্ত্রের গুহ্যবিদ্যার দ্যোতনা এসেছে তেমনি বহিরঙ্গে সমকালের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান যুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকে রামপ্রসাদচর্চা নিয়ে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। পরবর্তীকালে আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক নথিপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে তিনি ছিলেন হালিশহরের বাসিন্দা। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি ১৭২১-১৭২২ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন[১] । তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বিকা ও ভবানী। তাঁর সহোদর ভ্রাতার নাম বিশ্বনাথ, বৈমাত্রেও ভ্রাতার নাম নিধিরাম। 'বিদ্যাসুন্দর'এ রামপ্রসাদ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদুলাল ও জ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরীর নাম উল্লেখ

করেছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে রামপ্রসাদের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যটি ১৭৫৭র আগে রচিত নয়[২]। অষ্টাদশ শতকের বিশেষ কালপর্বেই রামপ্রসাদের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি। আনুমানিক ১৭৮১ থেকে ১৭৮৮র মধ্যবর্তী কোনো সময়ে তিনি পরলোক গমন করেন[৩]।

মধ্যযুগের বাংলার ঐতিহাসিক প্রক্ষাপটে অষ্টাদশ শতকেই সর্বাধিক রাজনৈতিক চাপানউতোর লক্ষ করা যায়। ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি আক্রমণের পর থেকে বাংলার মসনদে ঐস্লামিক শাসনের সূত্রপাত হলেও অন্ততপক্ষে গ্রামবাংলায় ক্ষেত্রে সরাসরি বড়ো রকমের পরিবর্তন হয়নি যা বাংলার প্রজাদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে বিস্ময়সূচক চিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলির বাংলার দেওয়ানী লাভের পর থেকে বাংলার প্রজাদের জীবনচর্যায় রাজনৈতিক প্রভাবের সূত্রপাত ঘটতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে লেখা সলিমুল্লার ‘তারিখ-ই-বাংলা’ গ্রন্থে এবং জেমস গ্রান্টের রচনা থেকে মুর্শিদকুলির আমলে সুবা বাংলার পরিস্থিতির বিষয়ে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। তবে মোটের ওপর এই সময় বাংলার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সদর্থক পদেই এগোচ্ছিল বলা চলে। মুর্শিদকুলির সুবাদারীতে দুইটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করা জরুরি। প্রথমত তিনি ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন মুকসুদাবাদে বা মুর্শিদাবাদে এবং দ্বিতীয়ত তাঁর আমলেই বাংলা থেকে দিল্লির রাজকোষে পাঠানোর জন্য বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ অনেকদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় কোটির কাছাকাছি[৪] । লক্ষণীয় সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী আমাদের উদ্দিষ্ট রামপ্রসাদ সেন (১৭২১-১৭২২ খ্রিষ্টাব্দ) মুর্শিদকুলির শাসনকালে জন্মেছিলেন। মুর্শিদকুলির পর বাংলার রাজগদি লাভের সংঘর্ষ দানা বাঁধে পিতা-পুত্র, শুজাউদ্দিন ও সরফরাজ খানের মধ্যে। ঘটনাচক্রে শুজাউদ্দিনই শাসক হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর সরফারজ খান সেইপদে অভিষিক্ত হন। মনে রাখতে হবে, মুর্শিদকুলির আগে বাংলার রাজনৈতক গদিপ্রাপ্তির লড়াই চলেছিল মূলত গঙ্গার উত্তর তটের অববাহিকায়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের রাজধানী হয়ে ওঠার ফলে দক্ষিণ বঙ্গ হয়ে উঠল রাজনীতির ‘পাখির চোখ’। মুঘল ও ইউরোপীয় প্রভাবে সমকালীন বাংলায় কিছু কিছু নগরের পত্তন ঘটেছিল। বর্ধমান, কাশীমবাজার, হুগলী এগুলির মধ্যে অন্যতম। শুজাউদ্দিনের(রাজত্বকালঃ ১৭২৭- ১৭৩৯) সমসাময়িক জৈন কবি নিহাল ‘বঙ্গাল দেশ কি গজল’ কবিতায় কাশীমবাজার অঞ্চলের বাংলার বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন-

বালুচর কসেরা হাট, বাসন বিকৈ বহুত সুবাট।
তাংতী লোক রহতৈ ঘনে, জামৈ বার চীবলী বুনৈ।।...
বসতী কাসমাবাজার, সৈদাবাদ খাগড়া সার।

রহতে লোক গুজরাতীক, টোপীবাল জেতী জাতীক।
আরব আরমনী আংরেজ, হুবসী হুমরজী উলাংদেজ …
ল্যবৈ বংদরো কী চীজ, বেচৈ মাল কপনা রীঝ।
করতে কোহুকা ব্যাপার রেসম জিনস কবড়া সার।[৫]

এইসব নগরে বিদেশী বণিকদের অস্তিত্বের কথাও পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দরের বর্ধমানে আগমনের পর সেখানকার বাজারের বাস্তব সম্মত যে বর্ণনা পাই তাতে নিহালের বর্ণনার সঙ্গে রামপ্রসাদের রচনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। 'বিদ্যাসুন্দর' এর বর্ণনা অনুযায়ী-

বণিজি দোকানি কত শত শত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই।।
বনাত মখমল পটু ভূসনাই খাসা।
বুটদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।।
আর আর কত কব আমীর পছন্দ।
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিস্মতের।।…
দুই পাশে চৌঁরি ঝাড়ে হাবশী গোলাম।
সরদার লোকে যত করিছে শেলাম।।[৬]

রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ভারতন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' এর পরে লেখা হলেও বর্ধমান নগরীকে চাক্ষুষ না করলে এইজাতীয় পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দেওয়া আদৌ সম্ভব বলে মনে হয়না। তাছাড়া সাধক রামপ্রসাদের সাধন প্রণালীর কথা তাঁর শাক্তপদে ছড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু সমকালকে অগ্রাহ্য করে যে সেই সৃষ্টি সম্ভব ছিল না, 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য তারই অন্যতম প্রমাণ।

১৭৪০এ সরফরাজ খানকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলার নবাব হয়ে উঠলেন আলিবর্দি। বাংলার মসনদের দ্বন্দ্বের সঙ্গেই চলছিল ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া। ১৭১৭সালে ইংরেজরা মুঘল বাদশার কাছ থেকে বাংলায় বাণিজ্যের ফরমান লাভের পর থেকে নবাবী বাংলার অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বিদেশী ইংরেজরা। অন্যদিকে ১৭৪২ থেকে প্রায় নয় বছর ব্যাপী বাংলায় বর্গী আক্রমণ চলতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে প্রাদেশিক শাসকদের সহায়তায় তিনি সন্ধি ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বর্গীদের দমনের চেষ্ঠা করতে থাকেন। ১৭৪২এর বর্গী আক্রমণে তথ্য পাই বর্ধমানের রাজসভার কবি বাণেশরের 'চিত্রচম্পূ' কাব্যে এবং

১৭৫১তে বর্গী আক্রমণে রাঢ়বঙ্গের ধ্বস্ত জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন গঙ্গারাম তাঁর ‘মহারাষ্ট পুরাণ’ কাব্যে। বর্গীদের আক্রমণে বাংলার প্রজাদের জীবনে যেমন বাঁচবার অনিশ্চয়তা ও ভীতি নেমে এসেছিল তেমনি বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ব্যহত হয়েছিল। অথচ বর্গীদের দুঃসহ আক্রমণে নদীয়াধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের ‘নীরব’ ভূমিকা কম আশ্চর্যজনক নয়। এমনকি তাঁরই দরবারের সভাকবি ভারতচন্দ্র তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে বর্গীদের নন্দীর প্রেরিত সেনা বলে উল্লেখ করেছিলেন[৭]।

আলিবর্দির পর বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দ্রুত বদল আসে। আলিবর্দির দৌহিত্র সিরাজদৌল্লার শাসনকালে ব্রিটিশ বণিকদের প্রতিপত্তিতে নবাব নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। অন্যদিকে সিরাজ-বিরোধী শিবিরের হিন্দুরাজা ও সিরাজের দরবারের একাংশের আঁতাতের ফলে পলাশীর যুদ্ধে(১৭৫৭, ২৩ জুন) ক্লাইভের কাছে নবাবের পরাজয় ঘটে। এরপর মসনদের অধিকার মীজাফরের উপর বর্তালেও রাজত্বের মূল চালিকা শক্তি ছিল ব্রিটিশ বণিকদের ইচ্ছাধীন। ইংরেজদের হাতে বাংলার শাসন ভার হস্তান্তরিত হওয়ার পর দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সহায়সম্বলহীন গ্রাম বাংলার দারিদ্র ও ভেঙে পড়া অর্থনীতি ফলে বাঙালির যাপনে গভীর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। মন্বন্তরের পরে ১১৭৭ বঙ্গাব্দে বর্ধমানের বাজারে আনাজপাতির অগ্নিমূল্যের উল্লেখ পাই ‘চণ্ডীমঙ্গল’এর একটি পুষ্পিকায়। সত্তর বছরের বৃদ্ধ অনুলেখক জানাচ্ছেন যে ১১৭৭ জ্যৈষ্ঠ মাসে ১২ সের চালের মূল্য ছিল ১ টাকা, আড়াই সের ভোজ্যতেল বিক্রি হয়েছিল ১টাকায়, ১৩ সের নুন ও ১১ সের কলাই ডালের মূল্য হয়েছিল ১টাকা[৮]। মন্বন্তরের পরে কৃষকরা চৌর্যবৃত্তি ধারণ করেছিল বলে জানিয়েছেন নদীয়ার দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র[৯]। ব্রিটিশদের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক সূত্রে কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চল থেকে একশ্রেণির বাঙালিরা অংশীদারি কারবার শুরু করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রভূত জমিদারী কিনে রাতারাতি কৌলীন্য অর্জনে সচেষ্ট হন। সাহেবদের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসার ফলে কলকাতার এই নববাবু সমাজে ক্রমশ ইঙ্গ-বঙ্গীয় দোয়াশলা সংস্কৃতির বিস্তার হয়। কলকাতা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের জমিদারী ও সেরেস্তার কাজকর্ম দেখাশুনোর জন্য ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালিরা ভিড় করতে থাকেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে রামপ্রসাদও রুটিরুজির তাড়নায় ‘তহবিলদারী’র কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তার কারণ তিনি সংসারী গৃহস্থ। তাঁকে সংসারী করে তোলার জন্য শ্যামা মায়ের প্রতি তাঁর অভিযোগ- ‘আমি তাই অভিমান করি/ আমায় করেছ গো মা সংসারী’। কিন্তু রুটিরুজির জন্য সাধনাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন জীবিকার। বীরাচারী তন্ত্রের তাত্বিক সাধনার আড়ালে তিনি ব্যক্তিমনের কথা জানান-‘আমায় দেও মা তবিলদারী/ আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী’। সেরেস্তায় কাজের সূত্রে রামপ্রসাদ ফার্সি ও আরবি শব্দে ব্যুৎপত্তি

অর্জন করেছিলেন। তাঁর পদসাহিত্যে ফার্সি ও আরবি শব্দের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। তিনি যেসব ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে উল্লেখনীয় কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'মা গো, তারা ও শঙ্করী' পদে ব্যবহৃত 'দরখাস্ত', 'বেগার', 'বাজার'; 'আমায় দেও মা তবিলদারী' পদে 'মাইনে'; মন তোর এত ভাবনা কেনে – 'রোসনায়'; 'মন হারালে কাজের গোড়া' পদে 'সওয়ার' ও 'তুর্কি'; 'মন রে কৃষিকাজ জান না' পদে ব্যবহৃত 'আবাদ', 'বাজাপ্ত'(বাজেয়াপ্ত); 'মন গরীবের কি দোষ আছে' পদে 'বাজিকর'; 'তুই যা রে, কি করিবি শমন' পদে 'হামেশা'; 'সাবাস মা দক্ষিণা কালী' পদে- 'সাবাস'; 'আমি কি আটাশে ছেলে' পদে ব্যবহৃত 'নালিশ', 'মোহর', 'দলিল', 'দস্তাবেজ' প্রভৃতি ফার্সি শব্দের উল্লেখ রয়েছে। বাংলায় মুঘল শাসন বলবৎ হওয়ার পর রাজভাষা রূপে আরবি শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতে ব্যবহৃত আরবি শব্দের কয়েকটি হল- 'মা গো তারা ও শঙ্করী' পদে – 'আসামী', 'হুজুর', 'উকিল'; 'আমায় দেও মা তবিলদারী' পদে ব্যবহৃত– 'তবিলদারী' ও 'জিম্মা'; 'মন রে কৃষিকাজ জান না' পদে- 'তছরুপ'; 'তুই যা রে, কি করিবি শমন' পদে – 'ফায়দা', 'কায়দা' ও 'রুজু'; 'তাই বলি মন জেগে থাক' পদটিতে– 'নহবৎ'; 'আমি ক্ষেমার খাস-তালুকের প্রজা' পদে ব্যবহৃত– 'তালুক'; 'আমি কি আটাশে ছেলে' পদে– 'সই' (সই করা অর্থে), 'সওয়াল' , 'মোকদ্দমা', 'মিছিল' প্রভৃতি আরবি শব্দ উল্লেখনীয়। এছাড়াও হিন্দি শব্দ ও 'ডিক্রি', 'ডিসমিস'এর মতো ইংরেজি শব্দও রামপ্রসাদ ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন আইন-আদালত ও জমিদারী কাজকর্মের সঙ্গে রামপ্রসাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এই সকল শব্দের প্রয়োগই তার নমুনা বহন করছে।

আসলে রামপ্রসাদের সাধক-মন কখনোই বিষয়-বাসনায় বৃত থাকতে পারেনি। তাঁর কাছে 'বিষয়' হয়ে উঠেছিল 'মদ'এর পরিপূরক। বিষয়-বিমুখ বলেই তিনি জানান-

> ম'লেম ভূতের বেগার খেটে
> আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
> নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
> আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।।[১০]

যদিও এইসব পদের অন্তর্কথায় তন্ত্রের গূঢ়তত্ব নিহিত আছে, কিন্তু বাহ্যত দৈনন্দিন যাপনে তাঁর টানাপড়েনের ছবিকেই তিনি ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন। ষড়রিপু তাঁর কলমে হয়ে উঠেছে ছয়টি বলদের প্রতীক। একটি পদে তিনি জানিয়েছেন-

> মা আমায় ঘুরাবে কত,

কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত।। [১১]

জীবনক্রমার ধাপে ধাপে রামপ্রসাদের মন বিষয়াসক্তি থেকে বীতরাগ হয়ে উঠেছিল। গৃহী রামপ্রসাদকে অতিক্রম করে সাধক রামপ্রসাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ সম্ভব হয়েছিল। রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতের পদগুলির নিরিখে মনে হতে পারে ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে তিনি বিষয়ী না হওয়ার কারণে দারিদ্রতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী রামপ্রসাদের বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। যেমন ১১৬৫র ২ বৈশাখ(১৭৫৮, ১২ এপ্রিল) সুভদ্রা দেবী নামের জনৈকা রামপ্রসাদকে একটি বাড়ি দান করেছিলেন। ওই বছরই ৪ ফাল্গুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে উখড়ায় ৩৫ বিঘা ও একুনে ৫১ বিঘা জমি দান করেন। ১১৬৫র ১৫ আষাঢ় রামপ্রসাদকে ২ বিঘা জমি প্রদান করেছিলেন সাবর্ণ চৌধুরী বংশের তালুকদার দর্পনারায়ণ রায়। এছাড়া দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একত্রে ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মার্চ রামপ্রসাদকে ৮ বিঘা জমি দান করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিসরে রামপ্রসাদ বিষয়ী না হওয়ার কারণে জমিজমার হিসেবেনিকেশ বা সংরক্ষণ করতে ততখানি উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারেননি বলেই মনে হয়। তবে দানপত্রগুলিতে উল্লিখিত তারিখের বিচারে বলা যায় ১৭৫৪ থেকে ১৭৫৮র আগে রামপ্রসাদের আর্থিক পরিস্থিতি সম্ভবত আরো খারাপ ছিল। অর্থাৎ মোটের উপর রামপ্রসাদের বিষয়বুদ্ধির অভাব ও নির্লিপ্ত মনই ছিল দারিদ্রের মুখ্য কারণ।

রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর'এর ভণিতায় একাধিকবার 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্রে 'কবিরঞ্জন'এর উল্লেখ দেখতে পাই না[১২] । বস্তুত 'কবিরঞ্জন' উপাধি যেই দিয়ে থাকুন না কেন রামপ্রসাদের পরিচিতি ওই বিশিষ্ট উপাধিতেই থেমে ছিল না বলাবাহুল্য। তিনি সাগ্রহে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কবি পদকে খারিজ করতে পেরেছিলেন। ভারতচন্দ্রকে যেখানে আজীবন কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কবি হয়েই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছিল, সেখানে সাধক রামপ্রসাদ উচ্চাশাকে নাকচ করে বাঙালির আবেগে স্থায়ী আসন লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি নির্ভেজাল স্বরে জানাতে পারেন 'মন, হারালে কাজের গোঁড়া/ দিবানিশি ভাবছো বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া'। টাকাকড়ি ও রুটিরুজির বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে একসময় সাধনার তুরীয় পর্যায়ে নিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অষ্টাদশ শতকের আর্থ-সামাজিক বেহাল পরিস্থিতির দিনে কেউ যখন কৌলীন্য প্রাপ্তির আশায় অর্থ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, ব্রাহ্মণ্য সমাজ যখন জাতপাতের পাঁকজলে সমাজকে অনুশাসনের দোহাই দিতে উদ্যত, মোটের উপর

আম-আদমি যখন আত্মস্বার্থ চরিতার্থে লিপ্ত তখন সাধক রামপ্রসাদের জবানবন্দী মুদ্রিত হয়েছে শ্যামাসংগীতের প্রকরণে-

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলবো দুলবো না গো।।
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে, বিষের কূপে উলবো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো।।
ধন-লোভে মত্ত হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে বুলবো না গো।
আশা-বায়ুগ্রস্থ হ'য়ে মনের কথা খুলবো না গো।।[১৩]

রামপ্রসাদের মতো বিষয় বিমুখ ও প্রকৃত সাধকের পক্ষেই এমন বিবৃতি দেওয়া সম্ভব।

বাংলার অষ্টাদশ শতকের ধর্মীয় পরিস্থিতির সঙ্গে রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত বিষয়ক পদের নিবিড় যোগ রয়েছে। রামপ্রসাদের শক্তিদেবীর আরাধনা এবং অষ্টাদশ শতকের শাক্তপদাবলির উদ্ভবের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার আগে বাংলার সামগ্রিক ধর্ম বিষয়ে সামান্য মুখপাত করে নেওয়া জরুরি। মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের বাংলার ধর্মীয় জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদগণের মাধ্যমে বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর থেকে বৈষ্ণব ধর্মের মূল সমস্যাই ছিল একক নেতৃত্বের অভাব। চৈতন্য-অনুবর্তী বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিমার্গ কেন্দ্রিক মত ও পথের অনৈক্য দেখা দেয়। যেমন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার উদ্ভাবিত 'গৌরনাগরবাদ' এবং নিত্যানন্দ ও তাঁর গোপালগণের সখ্যভাবের মধ্যে টানাপড়েন প্রকট ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছিল ক্ষমতার লড়াই। চৈতন্য ও তাঁর মুখ্য পরিকরবৃন্দের লোকান্তরের ফলে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ও মূলত অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্ম মূলত দুইটি ভিন্ন ধারায় বিস্তার লাভ করেছিল। একদিকে জাহ্নবা-শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রমুখ নেতৃত্বস্থানীয় বৈষ্ণবগণ খেতুরি উৎসবের মতো কয়েকটি ধর্মীয় সমাবেশের মধ্য দিয়ে বাংলার সর্বস্তরীয় বৈষ্ণবদের কাছে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের তত্ব ও দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। বলাবাহুল্য সর্বস্তরের বৈষ্ণবদের মধ্যে বৃন্দাবনী মতাদর্শ গৃহীত হয়নি। মূলত 'এলিট' শ্রেণির বৈষ্ণবরাই ছিলেন এই মতের সমর্থক। বৃন্দাবনী মতের সমর্থক এই ঘরানার বৈষ্ণবদের মধ্যে মূল প্রবণতাই ছিল রাজা-উজীর স্থানীয় অর্থবান ও প্রতিপত্তিঅলা ব্যক্তিত্বদের আনুগত্য লাভ। এক একজন মহান্তের বিলাসী জীবনযাপনের পিছনে থাকত ধনী শিষ্যের নির্ভেজাল অবদান। কৃষ্ণচরণ দাস বিরচিত 'শ্যামানন্দ প্রকাশ', নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তম

বিলাস', নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কিংবা মনোহর দাসের 'অনুরাগবল্লী' কাব্যে এই যুক্তির সপক্ষে বহু প্রমাণ রয়েছে। অদ্বৈত আচার্যের বংশজ বড়ো গোস্বামী শাখার অন্তর্গত রাঘবেন্দ্র প্রায় আশি বিঘা জমি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে অনুদান পেয়েছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। তত্ত্ব-মানা ও বৃন্দাবনের মঞ্জরীভাবের বাইরেও বৈষ্ণবদের একটি অংশ বর্তমান ছিল। এরাই পরে জাত-বৈষ্ণব, কর্তাভজা প্রভৃতি গৌণ ধর্মের রূপ লাভ করেছিল। রমাকান্ত চক্রবর্তী এই ধরনের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে তৈরি বা বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবিত ছাপান্নটি গৌণ ধর্মের উল্লেখ করেছেন [১৪]। এইসব অনুধর্ম গোষ্ঠীর উৎস ছিল চৈতন্য নির্দেশিত বৈষ্ণব ধর্মই।

সম্ভবত বৈষ্ণবদের মধ্যেকার নানান অন্তর্দ্বন্দের ফলে সাধারণ মানুষের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আস্থায় চিঁড় ধরেছিল। তাছাড়া চৈতন্যদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবের উপাসনার পক্ষপাতী। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছিলেন যে চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' ভাব সম্পন্ন। কিন্তু আঠার শতকের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপের আরাধনা করা উপযোগী ছিল না। বরং বাংলার প্রতিকূল পরিস্থিতে এমন কোনো ত্রাতার খোঁজ চলছিল যিনি আমজনতাকে অভয় দিতে পারেন, যাঁর স্নেহ-ছায়ায় নিয়তির কাছে হেরে যাওয়া মনুষ্যত্ব খিতু হতে পারে ,আবার তিনিই প্রয়োজনে শস্ত্র ধারণ করে শত্রু নিপাতে উদ্যত হতে পারেন। এই বিশেষ ভাবনা থেকেই অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ শাক্ত পদকর্তারা বেছে নিয়েছিলেন মাতৃ-আরাধনার পথকে। এমনকি ওই সময়ে বিষ্ণুপুরে বর্গী আক্রমণের জনশ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং 'কুঞ্জবিহারী' মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণও বর্গী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে দল-মাদল নামের কামান তুলে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য মূর্তিই যে তৎকালীন সাধারণ জনের অন্বিষ্ট ছিল সন্দেহ নেই। এই বিশেষ অভীপ্সার কারণেই বাংলায় শাক্তদেবীর আরাধনা ও সেই ভাবনা থেকে শাক্তপদাবলির সূচনা হয়েছিল। লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ শাক্ত পদকর্তারাই ছিলেন জমিদার, দেওয়ান কিংবা রাজকর্মচারী জাতীয় জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। শক্তি-সাধক বা শাক্তগীতিকারদের অর্চিত শক্তিদেবীর মূল ধারা প্রাচীন বাংলাতেও বর্তমান ছিল। বাংলার 'মালসী' গানের মূল বিষয়ই ছিল দেবী আরাধনা। বাংলার বিস্তৃত কালপর্ব জুড়ে শক্তিদেবী রূপে মনসা বা চণ্ডীর অবস্থান ছিল মঙ্গলকাব্যের গানে। কিন্তু চৈতন্য-আবির্ভাবের আগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে ওইসব দেবীমূর্তি ক্রুর রূপকেই অঙ্কিত করা হয়েছিল। চৈতন্যের ভক্তিভাব বিগলিত ধর্মের প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবীদের আপাত ক্রুরতা হ্রাস পেলেও আখ্যানের থাকবন্দী বিন্যাসে শক্তিদেবীদের করুণাময়ী মাতৃমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আঠার শতকের বিক্ষুব্ধ দেশ-কাল-পাত্রের নিরিখে শক্তিদেবীর কাঙ্ক্ষিত মাতৃমূর্তির পরিকল্পনায় যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন রামপ্রসাদ সেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যে সমকালীন শাক্তজীবনের আচার সর্বস্বতাকে নিয়ে সমালোচনা করে লিখেছিলেন-

ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।। …
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপাচারে।
মদ্যমাংস দিঞা কেহ যক্ষ পূজা করে।।
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল।।[১৫]

কিন্তু অষ্টাদশ শতকের কবি-সাধক রামপ্রসাদের শাক্তগীতিতে তিনি সরাসরি আচারবিচারকে নাকচ করে উপলব্ধিজাত মাতৃ-আরাধনাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের স্মৃতির অনুশাসন নিয়ন্ত্রিত সমাজে শাক্ত আচারের অঙ্গ হিসেবে বলিদানের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন “মেষ-ছাগল-মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে”। আবার তিনিই জানিয়েছেন- “তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা/ মা তো আমার ঘুষ খাবে না”। আসলে শক্তিদেবীর আরাধনার প্রশ্নে রামপ্রসাদ জোর দিয়েছিলেন ভক্তের আত্মোপলব্ধির ওপরে। আচার-বিষয় সব ত্যাগ করে ‘শ্যামা’ নামেই ডুব দিয়েছিল সাধক রামপ্রসাদের মন। সেইজন্য ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় হিসেবে একটি পদে লিখেছিলেন-

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদ-তলে প’ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।। … [১৬]

তাছাড়া রামপ্রসাদের পদের মাতৃবন্দনাতে সম্পৃক্ত হয়েছিল বৈষ্ণবের মধুর রস। আগমনী পর্যায়ের পদে মেনকার মাতৃ চরিত্র নির্মাণে মিশে থাকল কৃষ্ণলীলায় যশোদার মমত্বে মাখা মাতৃত্ব । আবার অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন-

যশোদা নাচাতো গো মা ব’লে নীলমণি;
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী?
একবার নাচ গো শ্যামা,-
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প’রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আঁড়-নয়নে চেয়ে চেয়ে,
গজমতি নাসায় নাসায় দুলুক;
যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে,
অষ্ট নায়িকা অষ্ট সখী হোক; … [১৭]

রামপ্রসাদের জগজ্জননীর সঙ্গে বৈষ্ণবতা ওতপ্রোত হয়েছিল নানা ভাবে। তিনি কখনো কৃষ্ণের রূপ কখনো রাধার রূপ ধারন করেছেন। একটি পদে বলা হচ্ছে-

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসনা কটি, এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী।। … [১৮]

বস্তুত রামপ্রসাদের পদে শাক্ত-বৈষ্ণব সম্প্রীতির প্রকৃষ্ট চিত্র ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সমকালীন বা পূর্ববর্তী সাহিত্য এই ধরণের সম্প্রীতির প্রসঙ্গ থাকলেও সেই মৈত্রীর মধ্যেও কোথাও বৈরিতার সুর লেগেছিল। যেমন বৈষ্ণব কাব্য 'ভক্তিরত্নাকর'এ জাহ্নবা দেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ে চণ্ডী-উপাসক পাষণ্ডীরা অবিশ্বাসী হলে কাব্যের 'বৈষ্ণব' রচয়িতা শক্তিদেবী চণ্ডীর মুখ দিয়ে জাহ্নবার স্তুতি বর্ণনা করিয়েছেন। দেবী পাষণ্ডীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

'অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া আপনা খাইলি।
সর্ব্বসাধ্য ভাগবতগণে নিন্দা কৈলি।।
মোর শিরোধার্য্যা এই সবার পূজিতা।
নিত্যানন্দ-বলরামচন্দ্রের বণিতা।। [১৯]

অন্যদিকে গঙ্গাধর দাসের 'কিরীটী মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় এর উল্টো পিঠের ছবি। সেখানে কবি, চৈতন্যকে দিয়ে দেবীর পূজা করিয়ে দেবী শক্তির কীর্তি নির্মানে প্রয়াসী হয়েছেন। কাব্যানুযায়ী-

দ্রুত চলে মহাপ্রভু সরোবরতীরে।
শঙ্খ পরিয়াছে মাতা দেখে গঙ্গাধরে।।
আসি মহাপ্রভু স্তব করে হস্ত-জোড়ে।
যেই রাধা সেই তুমি ভক্তি নিমাই করে।।[২০]

এখানেও শাক্ত-বৈষ্ণবের সম্প্রীতির ছবি থাকলেও বৈষ্ণবের হাতে শাক্তদেবীর পূজার্চনা করানোর মধ্য দিয়ে একভাবে শক্তিদেবীর গুণকীর্তন করানোই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু রামপ্রসাদের রচনায় এইজাতীয় ধর্মীয় সংস্কার লক্ষিত হয় না। তিনি শ্যাম-শ্যামা-শিবের বিভেদ মুছে ফেলে সকলকেই সমপ্রাণতা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। সেকারণেই তিনি জানিয়েছেন-

মন, ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুন্ঠবাসী।।
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম- সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা, রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি। … [২১]

অবশ্য রামপ্রসাদের পদের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকা বৈষ্ণবতার পিছনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যও থাকতে পারে। কারণ রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষদের নামকরণের মধ্যে শাক্তভাবের চেয়ে বৈষ্ণবতাই বেশি প্রশয় পেয়েছে। বৈদ্যকুলজিগ্রন্থ 'চন্দ্রপ্রভা'[২৩] মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী রামপ্রসাদের পূর্বজগণের মধ্যে নিত্যানন্দ, জগন্নাথ, যদুনন্দন, রাজীবলোচন, জয়কৃষ্ণ, রামেশ্বর, রামরাম প্রমুখ নামগুলি স্পষ্ট বৈষ্ণবতাকে নির্দেশ করে। অনুমান করতে পারি তাঁর পারিবারিক বৈষ্ণবতা ও ব্যক্তিগত উদার ধর্মবোধের কারণেই তিনি শ্যাম-শ্যামার অভেদ কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের বিশেষ কালপর্বের সঙ্গে রামপ্রসাদ সেন ও তাঁর সাহিত্য নিবিড় সম্বন্ধে যুক্ত ছিল সন্দেহ নেই। বাংলার সমকালকে স্বীকার করেই রামপ্রসাদী পদে যুক্ত হয়েছিল চিরকালীন সহৃদয় শ্রোতা-পাঠকের আবেদন। বস্তুত শাক্ত পদকর্তারা বৈষ্ণবদের মতো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের কথা বলেননি। তাঁরা ছিলেন 'মুখ্যত সাধক, গৌণত কবি'। এই বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-

রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোনও গোষ্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবনজিজ্ঞাসা- জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্তা বার বার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচিবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকিতে হইয়াছে।[২৩]

অবশ্য দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বা সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতো গবেষকদের বিচারে অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকে একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব ছিল। সুখময় মুখোপাধ্যায় হালিশহর-কুমারহট্ট নিবাসী জনপ্রিয় রামপ্রসাদ সেন ছাড়াও আরো সাতজন রামপ্রসাদের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন যাঁরা হালিশরের রামপ্রসাদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার শাক্তপদ রচনা করে নামডাকও পেয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগের ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে অনেকসময়ই পূর্ববর্তী বা সমকালের জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত কবির নাম ব্যবহার করে স্বল্প-পরিচিত অন্যান্য কবিদের কাব্য রচনা করতেন। কিন্তু প্রকৃত রামপ্রসাদ সেনের পদের ভাবমাধুর্য, সাধনার ক্রমবিন্যাস কিংবা সময়কালের বাস্তব জীবনচর্যার প্রতিফলনই তাঁকে 'বিশেষ' পর্যায়ে উন্নীত করেছে। তাঁর আপামর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে একাধিক রামপ্রসাদের অস্তিত্বের প্রাসঙ্গিকতা থাকত না।

তথ্যসূত্রঃ

১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, জুন ২০১১, পৃঃ ২৪৪
২. ঐ, পৃঃ ২৪৬
৩. ঐ, পৃঃ ২৪৫
৪. অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের বাংলা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃঃ ৫৯৬
৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪১৪, পৃঃ ৩০৯-৩১০
(পরে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ হবে)
৬. বিহারীলাল সরকার কর্তৃক মুদ্রিত, রামপ্রসাদ সেন বিরচিত বিদ্যাসুন্দর, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত(কলিকাতা), ১২৯৩, পৃঃ ১৮-১৯
৭. স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।

পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত।।
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।
দ্রষ্টব্যঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, মাঘ ১৩৪৯, পৃঃ ১৬

৮. বিশ্বভারতী 'লিপিকা' পুথিশালার পুথি, পুথিক্রমাঙ্কঃ ৬২৪০
৯. কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সংকলিত, ক্ষিতীশ-বংশাবলী পরিচয়, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত(কলকাতা), ১৯৩২, পৃঃ ২৭
১০. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়, ২০০২, পৃঃ ৭৬
(পরে 'শাক্ত পদাবলী' ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ হবে)
১১. ঐ, পৃঃ ৭৫
১২. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আষাঢ় ১৩৫৯, পৃঃ ২১
১৩. শাক্ত পদাবলী, পৃঃ ১৩৭-১৩৮
১৪. Ramakanta Chakravarti, Vaisnavism in Bengal, Sanskrit Pustak Bhandar, oct 1985, page: 349
১৫. সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫, পৃঃ ৬
১৬. শাক্ত পদাবলী, পৃঃ ১৪৮
১৭. ঐ, পৃঃ ৯৮
১৮. ঐ, পৃঃ ৬৬
১৯. রামদেব মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত, নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর, মুর্শিদাবাদ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, পৃঃ ৪৭০
২০. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩৭৭
২১. শাক্ত পদাবলী, পৃঃ ১১৪
২২. কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের পূর্ব্বপুরুষ, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ত্রিষষ্টিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃঃ ১১-১৬
২৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কার্তিক ১৪১৬, পৃঃ ২৮